বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমিস্টারে অন্তর্গত এস. ই . সি- টু কোর্সের জন্য উপস্থাপিত

প্রকল্প পত্র ঃ- বাংলা প্রহসনের ধারায় মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্র

শিক্ষার্থীর নাম ঃ-সাথী দিণ্ডা

সেমিস্টার ঃ- চতুর্থ

পত্র ঃ- এস. ই. সি -টু

রেজিস্ট্রেশন নং-২১১০৪০২৪১,২০২১-২০২২

রোল নং-১১১৪১৫২-২১০০২০

শিক্ষাবর্ষ ঃ- ২০২২-২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that ------Sathi Dinda------ Roll: ---1114152--- No: ---210020---. Reg.No:- ---211040241--- of ---2021-2022---, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/her project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Supervisors

....
Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

....
Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department,
Department of Bengali
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad, P.S.-Nandigram, Purba Medinipur, Pin-721650

Surajit Mandal
SACT-I, Department of Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

সূচিপত্র

(i) প্রথম অধ্যায় ঃ- প্রাসঙ্গ বিষয়ক আবিরন আলোচনা
(ii) দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ- বিষয়বস্তু নির্বাচন
(iii) তৃতীয় অধ্যায় ঃ- বিষয় বিশ্লেষণ
(iv) চতুর্থ অধ্যায় ঃ- (i) সিদ্ধান্ত
(ii) গ্রন্থপঞ্জী
(iii) কৃতজ্ঞতা স্বীকার

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্প বিষয়ক সাধারণ আলোচনা

ক) প্রকল্প কাকে বলে?

⇒ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদনা করা হয় তাকে প্রকল্প বলে।

খ) প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

⇒ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

i) সমস্যা কেন্দ্রিক : প্রকল্প হল সমস্যা কেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(ii) উদ্দেশ্য ভিত্তিক : কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য করে বা কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে,

(iii) সৃজনশীলতা : প্রকল্পের কাজের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা প্রকাশ ঘটে।

(iv) অভিনবত্ব : প্রকল্পমূলক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের মধ্যে অভিনবত্ব দেখা যায়,

(v) অনুসন্ধান মূলক কাজ : প্রকল্প করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা রকমে অনুসন্ধান মূলক কাজের মধ্য দিয়ে শেখে

(vi) বাস্তব কেন্দ্রিকতা প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোনো না কোনো বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে,

(vii) প্রকল্প মূলক কাজের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে সহযোগীতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলি গুলি বিকাশ ও হওয়ার সুযোগ গড়ে ওঠে।

③ প্রকল্প কত প্রকার হয় এবং কী কী?

⇒ সাধারণত 2 প্রকার হয় যথা — (i) একক প্রকল্প
(ii) দলগত প্রকল্প

④ প্রকল্প কাজের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

⇒ প্রকল্প কাজের উদ্দেশ্যগুলি হল —

(i) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ করা এবং তাদের দলবদ্ধ করা। মানসিক বিকাশ সাধিত করা,

(ii) ছাত্র ছাত্রীদের হাতে কলমে কাজ করতে শেখানো,

(iii) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা বোধ জাগিয়ে তোলা,

(iv) ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা কাজের প্রতিভাবে সহায়তা করা।

⑤ প্রকল্প মূলক কাজের উপকারিতা কী?

⇒ প্রকল্প রূপায়নের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত ভাবে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি হবে।

(iii) প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়ার বই বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনে সুযোগ পাওয়া যায়।

⑥ প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী?

⇒ বর্তমানে প্রতিযোগিতা মূলক আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য প্রকল্প গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, প্রতিটি দেশে এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে জন্যে সামগ্রিক অর্থনীতির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে, তারই অঙ্গ হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনা সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহন করা হয়ে থাকে, এবং সেই প্রকল্প সমূহ তত্ত্ব বিচার ভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় যাতে জাতীয় উন্নয়ন অব্যাহত থাকে,

বাংলা প্রহসন ধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাংলা নাটকের ধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান:

ভূমিকা: মধুসূদনের আবির্ভাব পূর্বে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি এবং ইংরেজী নাটকের অবদান খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইউরোপীয় নাট্য ধারাকে অনুসরণ করেই বাংলা নাটক ও লিখতে চেয়েছিলেন, বেলগেছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ন তর্করত্নের রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দেখার পর মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের দুর্দশা উপলব্ধি করে ছিলেন। এই ধরনের নাটক কে অলীক কুনাট্য বলে চিহ্নিত করেছেন, এই বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্মরণীয় হয়ে আছেন, এই কারণেই যে ওই নাট্যশালাকে কেন্দ্র করে বাংলা নাট্য সাহিত্যের মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব ঘটে এরপর তিনি শর্মিষ্ঠা নামক নাটকটি রচনা করেন এবং ওই বছরই ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে নাটকটি অভিনীত হয়।

নাট্য সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের অবদান:

(i) বাংলা নাটকে মধুসূদন প্রথম পাশ্চাত্য রীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

(ii) বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক লিখেছেন।

(iii) প্রহসন রচনায় তিনি তৎকালীন সমাজের নীচতা, স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামি প্রভৃতিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

(iv) চরিত্র সৃষ্টিতেও মধুসূদন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পিতা ভীম সিংহ কন্যা কৃষ্ণকুমারী দাস দাসী হিসাবে ধনদাস বিলাসবতী প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

(v) মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রহসন বিধি রচনা করেছেন।

সবমিলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটক সাহিত্যের নব সৃষ্টির পথিকৃৎ ছিলেন।

মধুসূদনের নাটক সমূহ

মধুসূদনের নাটকগুলি ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় —

(ক) পৌরাণিক নাটক :— (i) শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)
(ii) পদ্মাবতী (১৮৬০)
(iii) মায়া কানন (১৮৭৪)

(খ) ঐতিহাসিক নাটক — (i) কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)

(গ) প্রহসনধর্মী নাটক — (i) একেই কী বলে সভ্যতা (১৮৬০)
(ii) বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

একেই কি বলে সভ্যতা :

~~প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে~~

বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে মধুসূদন প্রহসন অভিনীত না হলেও ১৮৬৫ সালের ১৮ জুলাই শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে প্রহসনটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়, জনপ্রিয়তার জন্য সংবাদ প্রভাকরে প্রশংসা বেরোয়। দশদিন পরে পর দ্বিতীয়বার অভিনয় হলে, রাজা দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন, দ্বিতীয়বারের অভিনয় আরো ভাল হয়, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে অভিনয়ের প্রশংসা প্রকাশিত হয়, অভিনয় দেখার সৌভাগ্য মধুসূদনের হয় নি, তখন তিনি ফ্রান্সে। সেকালের পথভ্রষ্ট নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবন্ত আলেখ্য বলে প্রহসনের অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ইয়ংবেঙ্গলের ছায়াপাত ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। জনৈক বৈষ্ণব ভক্তের পুত্র নবকুমার ও তার বন্ধু কালীনাথ মদ্যপানে আসক্ত। দুজনে কলেজে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং নিজেদের তারা কুসংস্কার-বর্জিত সভ্য যুবক বলে ভাবে। তারা জ্ঞানার্জনের জন্য সিকদারপাড়ার গলিতে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী' নামে এক সভা স্থাপন করেছে। প্রতি শনিবারে সেখানে অধিবেশন বসে। মদ্য ও তামাকের শ্রাদ্ধ করা হয়, খেমটা নাচ চলে, নিতম্বিনী পয়োধরীদের সঙ্গে ঢলাঢলি রসিকতায় সবাই বিভোর হয়। অন্ধ অলিপথে গোপন আস্তানায় এই সব অসামাজিক কাজকর্ম চলে, রাজনারায়ন বসুর মতে "তাহারা মনে করিতেন এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের শির জয়লাভ করা, মনে রাখা দরকার, এই মদ্যপানাসক্তি দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে তখন নাগরিক সমাজের মধ্যে দারুনভাবে সংক্রামিত হয়, এ ব্যাপারে প্যারীচরন সরকার প্রমুখ ব্যক্তিরা সুরাপান নিবারনী আন্দোলন চালান। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র ও অন্যান্য নাট্যকারও ব্যাপারটিকে নিয়ে প্রহসন রচনা করেন।"

জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার বলাই, চৈতন, মহেশ ও শিবু, নবকুমার কালীনাথের কথাবার্তা বাংলা ইংরেজী মেশানো খিচুড়ি ভাষায়। কাজকর্ম থাকার জন্য সভায় আসতে নবকুমারের একটু দেরী — 'এক্সকিউজ করতে হবে'। একথা শুনে শিবু প্রমত্তভাবে বলে 'দ্যাটস এ লাই'। নবকুমার ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দেয় — হোয়াট, তুমি আমাকে লায়ার বল? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি শুট করব।
পারিস্থিতি সামাল দিতে চৈতন বলে, একটা — ট্রাইফ্লিং
ট্রাইফ্লিং কথা নিয়ে মিছে ঝগড়া কেন? নবকুমার
তখন উক্তি — ট্রাইফ্লিং ও আমাকে

লাহিয়র বললে, আবার ট্রাইফ্লিং? ও আমাকে বাঙলা করে বল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যেবাদী বললে না কেন? তাতে কোন শালা রাগতো? কিন্তু লাহিয়র - এ কি বরদাস্ত হয়। তারপর নবকুমার সদস্যদের সামনে ভাষণ দেয়। জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা। এর সদস্যরা জলি গুড ফেলোজ।

এদের কাছে স্বাধীনতার লক্ষ্য হল - "এখানে যার খুশি সে তার কর, ইন দি নেম অব ফ্রিডম, লেট অ্যাস এনজয় আওয়ার সেলভস।" এরা মদ্যপান ও নারীসম্ভোগ করে, মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। লজ্জার জ্ঞান থাকে না, পিতামাতা পরিজনদের সামনে মাতলামি শুরু করে। হর কামিনীর কথায় এদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। " বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েছি। ... মদমাংস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?

এই প্রহসনে একদিনের ঘটনা স্বল্প পরিসরে বর্ণিত। এতে অনেক কিছুই ধরা পড়েছে। চরিত্রগুলি সংলাপ একান্ত বাস্তব ও স্বাভাবিক। খণ্ডচিত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে নিখুঁত ভাবে সংযুক্ত হয়ে এক অখণ্ড রস সৃষ্টি করেছে। বাস্তব চরিত্রের চিত্রাঙ্কন খুবই সার্থক। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা কুশিক্ষা হয়ে যুবসমাজকে অধোগামী করেছিল। মধুসূদন নিবিড় বাস্তবজ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে তা অঙ্কিত করেছেন। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সভ্যগণ, রাস্তার মুটে মজুর, বৈষ্ণব বাবাজী, ঘুষখোর পুলিস সার্জেন্ট ও দক্ষ গানিকার চরিত্রগুলি এক এক

আঁচড়ে মধুসূদন জীবন্ত করে তুলেছেন, তখন মুসলমান মুখে মুটে বেহারার সংলাপ মধুসূদন ভাষাজ্ঞান ও চরিত্র-বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় তুলে ধরেছে। কলকাতার মধ্যবিত্ত যুবসমাজের কেউ কেউ সভ্যতার নামে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল অনাচারে লিপ্ত ছিল তারই দলিল এই প্রহসন।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ :-

এই প্রহসনটির বিদ্রূপ ইয়ংবেঙ্গল দলের পাত বর্জিত হয় নি। ইয়ংবেঙ্গলের সঙ্গে বহিঃরঙ্গের কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। ডিরোজিওর তরুণ শিষ্যরা ঈশ্বর, ধর্ম, জাতপাত ও পাঁজিপুঁথি মানতেন না। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতেন। হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মবিশ্বাসে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা ছিল, মদমাংসে অনীহা ছিল না। সেদিক থেকে তাঁরা ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন না।

ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রবীণ। তাঁরা ১৮৩৮ সালে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সদস্যদের মতো তাঁরা সেখানে টোস্ট, খানা মদ্যপান করতেন না। বাংলা ইংরেজী-মেশানো খিচুড়ি ভাষায় বক্তৃতা দিতেন না। গণিকা বাঈজীদের নিয়ে নিষিদ্ধ আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকতেন না। বাড়ি ফিরে পিতামাতার সামনে মাতলামি করতেন না। ইয়ংবেঙ্গলদের অনুসরণে কলকাতার কিছু যুবক অনাচার ও উচ্ছৃংখলতাকে সভ্যতার প্রজাতি মনে করত।

তাদের প্রতিই মধুসূদনের ব্যঙ্গবিদ্রূপ কৌতুক, মধুসূদনের নিক্ষিপ্ত বাণ তথাকথিত ইয়ংবেঙ্গলদের প্রতি নয়। মধুসূদন নিজে ইয়ংবেঙ্গলের দলে ছিলেন। মদ্যপান করতেন। কিন্তু মাতলামি করতেন না।

মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসনটি গ্রামকেন্দ্রিক বিপরীতমুখী ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত, এখানে আক্রমণের লক্ষ্য গ্রামের এক বৃদ্ধ ধর্মধ্বজী ধর্মবকের নির্বিচারে নারীভোগ ও শেষে চরম লাঞ্ছনাপ্রাপ্তি। এই প্রহসনের প্রথম নাম ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির' ভগ্ন শিবমন্দিরেই গ্রামের জমিদার ও আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কামতৃষ্ণা নিবারণার্থে তাঁরই প্রজা হানিফের সুন্দরী বিবি নবযৌবনা ফতেমাকে ভোগ করতে গিয়ে বাচস্পতি ও হানিফের হাতে প্রহৃত, লাঞ্ছিত হয়েছে। শেষে অর্থদণ্ড দিয়ে নিজের কুকীর্তি জনসমাজে গোপন রাখার চেষ্টা করেছে। চিরতরে এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে।

লোলচর্ম বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদ অত্যন্ত কৃপণ অর্থগৃধ্নু। দুঃস্থ রায়তদের বাকী খাজনার কানাকড়িও ছাড়তে তিনি রাজী নন। দরিদ্র মুসলমান কৃষক হানিফকে পীড়ন করতে তাঁর বিবেকে বাধে না। মাতৃদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ বাচস্পতিকে পাঁচটি টাকা দিতে হাত কাঁপে, অথচ প্রবলতর কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য হানিফকে প্রচুর অর্থ দিতে তাঁর বাধে না, যৌবনকাল থেকে তিনি বহু পরস্ত্রী সংসর্গ করে এসেছেন। বহু সরলা বালিকার সর্বনাশ করেছেন। কামার্ত্ত ভক্তপ্রসাদের নারীভোগের ব্যাপারে জাতিবিচার নেই,

খাদ্য বিচারে এঁরা নিষ্ঠাবান কিন্তু যৌনসংসর্গে নির্বিকার। ভক্তপ্রসাদ হানিফের রূপবতী যুবতী স্ত্রী ফতিমার কথা পরিচারক গদার কাছে শুনে তার [illegible] ক্ষুব্ধ করে দিল। উদ্দেশ্য ফতেমাকে ভোগ করা। এ ব্যাপারে সাহায্য করল গদা ও পোষা পাঁচি কুট্টনি। পাঁচি ফতিমাকে প্রলুব্ধ করে "সোনায় খাবি, সোনায় পরবি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাকবি?" এদের কাছে সব কথা শুনে বুদ্ধিমতী ফতিমা স্বামীকে জানিয়ে কৌশলের জাল পাতে। ফতিমাকে নিয়ে পাঁচি গোপনে ভগ্ন শিবমন্দিরে উপস্থিত হয়। পরে সেখানে ভক্তপ্রসাদের আবির্ভাব। অদূরে গাছের আড়ালে অন্ধকারে হানিফ ও বাচস্পতি অপেক্ষা করছিল। কামোন্মত্ত ভক্তপ্রসাদ ফতিমার রূপযৌবনের স্তুতি শুরু করে, ফতিমাকে নিয়ে শিবমন্দিরে ঢুকতে যাবে এমন সময় যমদূতের মতো হানিফ মুখ ঢেকে ভক্তপ্রসাদ, পাঁচি ও গদাকে শক্ত কিল ঘুষি মেরে কাবু করে ফেললে। তারপর হানিফ বাচস্পতি আত্মপ্রকাশ করল। হানিফের কণ্ঠ থেকে ব্যঙ্গবাণ বেরুতে থাকে। এই ঘোর দুর্বিপাকে ভক্তপ্রসাদ হানিফকে কিছু দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চাইলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। এবার হানিফকে ব্যঙ্গে আরো ধার বাড়ল, দিয়ে কোনোরকমে মান বাঁচালেন। ভবিষ্যতে আর যাতে তার এমন দুর্মতি না হয় সেজন্য নারায়ণের কাছে প্রার্থনা জানালেন। নাটকের শেষে কবির উক্তবাক্যটি খুবই উপভোগ্য।

হাল্কাচালে দলবৃত্ত (স্বরবৃত্ত) ছন্দে এটি রচিত বলে প্রহসনের সংলাপ ও ভাষার উপযোগী হয়েছে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সম্ভবত তা ঠিক নয়। দলবৃত্ত ছন্দের মাত্রাবিচারে (রুদ্ধদল ও মুক্তদল দুই ছন্দে শব্দের সর্বত্র একমাত্রা হিসাবে গণ্য) প্রতিপর্ব চারমাত্রা। কেবল 'বুড়োশালিকের' অংশে একমাত্রা বেশি, এইমাত্র ব্যতিক্রম। মাত্রাবৃত্ত ধ্বনিপ্রধান ও কলাবৃত্ত ছন্দের মাত্রাবিচারে প্রতিপর্বে মাত্রার সমতা থাকবে না। ভক্তপ্রসাদ, গদা, পাঁচি ও বাচস্পতি মুখের ভাষায় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সে যাহোক, এই প্রহসনে সংলাপের ভাষা চরিত্রানুগ হয়েছে। হানিফ ও ফতিমার মুখে যশোহরের গ্রাম্য ভাষা দিয়ে মধুসূদন হাস্যকর পরিবেশ ও কৌতুকরস সৃষ্টি করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র দুটি স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রহসনে ছড়া, প্রবাদবাক্য ও কবিতার অংশ সন্নিবেশ করে রচনাকে বেশ সরস ও কৌতুকপূর্ণ করে তুলেছেন।

মধুসূদন আপন প্রতিভাবলে কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে অমসৃণ পথকে অনেকটা অনায়াসগম্য মসৃণ করে দিয়ে যান। সেই পথেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, এখানেই মধুসূদনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

বাংলা প্রহসন ধারায় দীনবন্ধু মিত্রের অবদান

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০ - ১৮৭৩) :- মধুসূদনের পরে দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাটকে নবযুগ সৃষ্টি করেন। নাটকের জন্য পুরাণ ও ইতিহাসের দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন নেই - আমাদের চারপাশে সাধারন মানব - মানবীর জীবনকে নিয়ে যে উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হতে পারে তার জাজ্বল্য প্রমান দীনবন্ধু মিত্র রচিত কয়েকটি নাটক। দীনবন্ধু কাছের মানুষের নাট্যকার। তাঁর কল্পনা জীবনধর্মী ও ভূমিতলবিহারী মোহিতলাল মজুমদার যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, দীনবন্ধুকে বুঝতে হলে বাঙালি হয়ে বাঙালিকে বুঝতে হবে। তিনি দেশকালপাত্রের দাবিকে স্বীকার করে নিয়ে দেশের আলো - বায়ু - জল ও দেশের জাতীয় চেতনা থেকে রসসংগ্রহ করেছেন। দেশের মানুষের শক্তি ও সংগ্রাম, দুঃখ - যন্ত্রনা, আত্মত্যাগ, নানা ত্রুটি ও অসঙ্গতিকে ব্যাপক সহানুভূতিতে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব দীনবন্ধু মিত্র।

দীনবন্ধু মিত্র নদীয়ার চৌবেড়িয়া গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ১৮৩০ সালে জন্মগ্রহন করেন। পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়ার পর পিতা তাঁকে জমিদারী সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করেন। উচ্চশিক্ষা জন্য অল্পবয়সে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। পিতৃব্যের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে লেখাপড়া চালাতে থাকেন, লঙ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষা শুরু করে 'দীনবন্ধু' নাম গ্রহণ করেন

এই লং সাহেবই পরে দীনবন্ধুর নীলদর্পন নাটকের
ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন, ১৮৫০ খ্রিঃ হেয়ার
স্কুলের শেষ পরীক্ষায়। বৃত্তিলাভ করে হিন্দু কলেজে
ভর্তি হন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর
পেতেন, কলেজের সব পরিক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন।
শেষ পরীক্ষা না দিয়ে ১৮৫৫ খ্রিঃ পাটনায় পোস্টমাস্টার
পদ গ্রহন করেন। ক্রমে পদবৃদ্ধি, উড়িষ্যা, নদীয়া ও
ঢাকা বিভাগে চাকরী, অল্পদিনের মধ্যেই পোস্টাল
ইনস্পেক্টরের পদে উন্নীত হন। লুসাই যুদ্ধের সময় ১৮৭১
সালে ডাক ব্যবস্থার তদারকির জন্য কাছাড়ে প্রেরিত হন।
ওই বছর সরকার কর্তৃক রায়বাহাদুর উপাধি লাভ। দক্ষ
কর্মচারী হয়েও উপযুক্ত বেতন পাননি তেতাল্লিশ বছর বয়সে
১ নভেম্বর, ১৮৭৩ সালে মৃত্যু। দীনবন্ধু [illegible] অকপট
নিঃস্বার্থ, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল, সুরসিক, নিরভিমানী ও
সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ হাস্যকৌতুকের জন্য
সকলে তাঁকে ভালবাসত। ডাকবিভাগে চাকুরী পেয়ে তাঁকে
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ও আসামের বহু অঞ্চলে ঘুরতে হয়।
বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন - ঢাকা, বরিশাল, উত্তর - পশ্চিম দার্জিলিং,
কাছাড়, মনিপুর, গঞ্জাম প্রভৃতি স্থানে বার বার ঘুরতে হয়েছে,
বহু গ্রামে ঘোরা ফেরা করেছেন, বহুলোকের সঙ্গে আন্তরিকভাবে
মিশেছেন। তাঁদের বুকের ব্যথা ও মুখের হাসি অনুভব করেছেন,
তাদের মুখের বুলি আয়ত্ত করেছেন। দেশের সঙ্গে, দেশের
মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে।
বারো বছর তার সন্তান না পাওয়ার
গৃহত্যাগ করে। হরবিলাস পোষ্যপুত্র করলেন, মহাকুলীন
কলশীল বালককে
নদেরচাঁদের হস্তে লীলাবতীকে সমর্পনের সিদ্ধান্ত নেন,
নদেরচাঁদ বদাকার, ইতর, অশিক্ষিত ও নেশাখোর,
নদেরচাঁদের পশুবৎ অত্যাচারের ফলশয্যার
রাত্রিতেই তার প্রথমা বালিকা স্ত্রীর মৃত্যু
ঘটে।

বহু বিচিত্র ঘটনা এই নাটকের জট পাকিয়েছে, শেষে জটিল গ্রন্থির উন্মোচন ঘটেছে। নদেরচাঁদের কারাবাস ও অর্থদণ্ড হয়েছে, অরবিন্দ ফিরে এসে নিজপত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ললিতমোহন ও লীলাবতীর পূর্বপ্রণয় বিবাহের মধ্য দিয়ে নাটকের সুখ সমাপ্তি ঘটেছে।

সমালোচকের মতে ইংরেজী রোমান্স ও সংস্কৃত কাব্য নাটকের নায়িকার অনুসরণে লীলাবতী চরিত্রটি অঙ্কিত। এতে ঔচিত্যবোধ ও প্রতীতির হানি ঘটেছে। নদেরচাঁদ ও তার দোসর হেমচাঁদ স্বভাবসঙ্গত। পয়ার ছন্দে সংলাপ কৃত্রিম। অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার ও চরিত্র অনেক আছে। নানাবিধ্নের চরিত্র এর নাট্যরস সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। তবে নাটকটি পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজ-সমস্যায় বিস্তৃত হতে পারেনি।

বিয়ে - পাগলা বুড়ো (১৮৬৬):- দীনবন্ধুর প্রথম প্রহসন এটি। বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন। বিয়ে-পাগলা বুড়ো জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে লিখিত। সে সময় বহু ধনবান বৃদ্ধ তরুণীকে বিয়ে করত, তাই প্রবাদবাক্য প্রচলিত - "বৃদ্ধস্য তরুণী-ভার্যা"। নাটকের নায়ক রাজীবলোচন বৃদ্ধ, অর্থবান, কৃপণ ও লোভী, পরের জমিজমা কলাকৌশলে হস্তগত করেন, আধুনিক শিক্ষার ঘোর বিরোধী। কাউকে কানাকড়ি দান করেন না। সেবাযত্নের জন্যে বাড়িতে দুজন বিধবাকে আশ্রয় দিয়েছেন। বুড়ো হয়ে মরতে চলেছেন তবুও তাঁর বিয়ের সাধ প্রবল। এর জন্য অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হন না। স্কুলের ছেলেরা স্ত্রী সাজল। বিবাহের ঠিক আয়োজন করল। বিবাহের পর বাসরঘরে যেমন রঙ্গরসিকতা হল, রতন ছেলেটি নববধূর ভূমিকা ভালোভাবে অভিনয় করে, রাজীব বাড়িতে নববধূকে নিয়ে এসে দেখে, পেঁচোর মা তিলি গহনা পরে নববধূ সেজেছে, সঙ্গে শূকরছানা। হাস্যকর পরিণতির মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি, রাজীব ছেলেদের উদ্দেশে গালি দিলেন।

ভগ্নমনোরথ রাজীবের এই আর্তনাদের বেদনা দীনবন্ধু মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। এই আর্তনাদে কৌতুক আছে, কিন্তু প্রহসনের খোঁচা নেই, মানুষের অসজাতির উপর দীনবন্ধু কারুণ্যের রশ্মি নিক্ষেপ করেছেন কৌতুক এখানে হিউমার পর্যায়ে উন্নীত মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, — যে দৃষ্টিতে জীবনকে দেখতে পারলে একই সঙ্গে নয়ন অশ্রুসজল ও আনন হাস্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে সেটাই শ্রেষ্ঠ হিউমার।

এই নাটকের পিছনে নাট্যকারের সমাজ-সংস্কারের কোনো প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা থাকতে পারে, সৃষ্টির কলানৈপুণ্য বিচারে তাঁর প্রহসনে মৌলিক রসসৃষ্টির পরিচয় মেলে। মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন —

জামাইবারিক (১৮৭২) 'জামাইবারিক' এ বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার কুফল দেখানো হয়েছে। সমাজের দুই বাস্তব ও করুন বিষয় নিয়ে এটি রচিত, শ্বশুরবাড়িতে বেকার ও নিষ্কর্মা কুলীন ঘরজামাইদের করুন অবস্থা ও সপত্নী মধ্যে কলহপীড়িত বিপত্নীক স্বামীর দুর্দশা চিত্রিত হয়েছে। রামগতি ন্যায়রত্নের মতে কৌলিন্যানুরোধে যারা ঘরজামাই রাখেন বা ঘরজামাই থাকেন এই পুস্তকপাঠের তাঁদের চৈতন্য হবার সম্ভাবনা। এর পিছনে কলকাতার কোনো ধনী পরিবারের কাহিনী লুকিয়ে আছে বলে অনেক মনে করেন। এই নাটকের প্রথম কাহিনীতে আছে দুই পত্নী বগলামুখী ও বিন্দুবাসিনীর বিশ্রী কলহ ও গালিগালাজে স্বামী পদ্মলোচনের মানসিক ও শারীরিক লাঞ্ছনা। দ্বিতীয়টিতে ঘরজামাই অভয়কুমারের অপমান। পদ্মলোচনের প্রতিবেশী অভয়কুমার জমিদার বিজয়বল্লভের বড় জামাই - এর একজন জমিদার বাড়ি কুলীন। নিষ্কর্মা হতদরিদ্র অপদার্থ জামাইরা হীনতা স্বীকার করে শ্বশুরের ব্যারাক ঘরে থাকে। তারা নানারকম নেশা করে। হাল্কা গান, রঙ্গরসিকতা ও নিষ্কর্ম পুস্তকপাঠে গতানুগতিক জীবন কাটায়। শাশুড়ির অনুমতি পেলে মাঝেমধ্যে

অন্তঃপুরে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়। তাসত্ত্বেও অভয়কুমারের কিছুটা আত্মসম্মানবোধ ও অভিমান আছে। তার স্ত্রী কামিনী স্বীনগর্বে অত্যন্ত কোপনস্বভাবা। কামিনী একবার দারুন অপমান করলে অভয়কুমার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তাকে মিত্রবল্লভ ফিরিয়ে আনে। একবার কলহে কামিনী স্বামীকে লাথি মারবে বলে চূড়ান্ত অপমান করেন। সে আবার তীব্র আঘাতে অপমানে ও দারুন দুঃখে স্ত্রীকে ত্যাগ করে বৈষ্ণবের বেশে বৃন্দাবনে চলে যায়। এদিকে পদ্মলোচনও দুই স্ত্রীর নিত্য কলহে অতিষ্ঠ হয়ে বৃন্দাবনে এক বৈষ্ণবকাকাতীর আখড়ায় উঠে। স্বামী চলে গেলে, কামিনীর হৃদয়ের পরিবর্তন হয়। সে পরিচারিকার সঙ্গে বেরিয়ে বৃন্দাবনে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়। এদিকে বগলামুখী ও বিন্দুবাসিনী মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠে। এই সংবাদ নিয়ে পদ্মলোচন অভয়কুমার ও কামিনীর সঙ্গে ঘরে ফিরে আসে। দুই স্ত্রী তাকে পরম ভক্তিভরে গ্রহণ করে।

নাটকে দুটি কাহিনী স্বতন্ত্রভাবে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে চতুর্থ অঙ্কে একত্রিত হয়েছে, এতে নাট্যকারের সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। কাহিনী সৃষ্টি ও চরিত্র সমাবেশে যথেষ্ট কুশলতা দেখিয়েছেন। অপ্রাসঙ্গিক বা অতিরিক্ত অনাবশ্যক বিষয় নেই। ঘটনাবৈচিত্র্য মূল বিষয়ে সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে গেছে।

সধবার একাদশী (১৮৬৬) :-

দীনবন্ধুর অন্যতম সৃষ্টি 'সধবার একাদশী', এটি না নাটক না প্রহসন, স্থূল রুচি ও অশ্লীলতার জন্য এটি সাহিত্যপদবাচ্য নয়। এই নিয়ে বিতর্ক আছে। নাটকে নব্যপন্থী ইয়ং বেঙ্গলের পশ্চাৎসারী কলকাতার যুব সমাজের পানদোষের কুফল দেখানো হয়েছে।

এর আগে প্যারীচাঁদ মিত্র 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' - গ্রন্থে মদ্যপানের কুফল দেখান। মদ্যপানের বিষময় ফল থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য প্যারীচরন সরকার Temperance Society প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক গনমান্য ব্যক্তি যোগ দেন, সধবার একাদশী বের হলে প্যারীচরন সরকার দীনবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বলেন - 'আপনার যে বহি বাহির হইয়াছে তাতে আমাদের সোসাইটি উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে'।

যাহোক, সধবার একাদশী উৎকৃষ্ট প্রহসন, এতে নাট্যলক্ষন যথেষ্ট। কলকাতার ধনী জীবনচন্দ্র দত্তের বখাটে পুত্র মূর্খ অটল এর নায়ক। সে মদ্যপান করে, গনিকা নিয়ে থাকে, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে। সুন্দরী স্ত্রীকে অবহেলা করে কাঞ্চন নামে শহরের এক দেহ ব্যবসায়িনীকে রক্ষিতা রাখে, সোনার গয়না দিয়ে মাসিক তিনশ' টাকা মাসোহারায় তাকে বাড়িতে পোষে, কাঞ্চন বহুবল্লভা - সে অটলকে ছেড়ে তার খুড়শ্বশুর গোকুলচন্দ্রের কাছে যেতে। কাঞ্চনের এই আচরনে গোকুলচন্দ্রের স্ত্রীকে অপহরন করে মাতাল অটল বাগানে নিয়ে যেতে চায়, পরে অটল ও তার সাথী নিমে দত্ত উত্তমভাবে চড়চাপড়ে প্রহৃত হয় পিতৃব্য রামমানিক্যবাবুর হাতে। প্রহারেও বখাটে মদ্যপ লম্পট অটলের চৈতন্য হয় না। সে খুড়শাশুড়িকেও হরন করে বাগানে নিয়ে যেতে চায়। অটলের স্ত্রী কুমুদিনী দুঃখে বলে 'এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল'। দুশ্চরিত্র মদ্যপ স্বামী থাকা সত্ত্বেও সে বৈধব্য কামনা করে, সধবা হয়েও সে বিধবার থেকে আরো বেশি মর্মযন্ত্রনা ভোগ করে,

অটল মদের দোকানের ক্যাটালগ ছাড়া আর কিছু পড়ে না। প্রচুর অর্থব্যয়ে বাজারে রক্ষিতা রাখার জন্যে অসহায় পিতাকে আলিআলাদা করেন, স্নেহান্ধ মা প্রতিষ্ঠা রাখার জন্য অটলের কোনো দোষ দেখেন না, কাঞ্চন অটলকে ত্যাগ করতে চাইলে মা তাকে ঘরে পুনরায় ডেকে আনেন, ঘৃণায় ভয়ে অটলের কাছে তার বোন আসতে চায় না, অটলের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই, তার চরিত্রের কোনো পরিবর্তন নাটকে ঘটেনি।

এই নাটকে নানাশ্রেণীর চরিত্র ভীড় করে এসেছে, সমকালীন কলকাতার অন্ধকারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে নাটকে, অনেক চরিত্রের কিছু ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য আছে, মাতাল ও সুশিক্ষিত নিমে দত্তের চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। অত্যন্ত পানাসক্তির জন্যে সে নিজেকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে পারেনি। মদ্যপান, কুসঙ্গে আহারবিহারের জন্য নিমের প্রতি তার স্ত্রী অত্যন্ত বিরক্ত, নিমে দত্ত মদের ঘোরে বিলাপ করে সে সকলের ঘৃণাস্পদ অযোগ্য ব্যক্তি। অবচেতন সত্তা থেকে দারুণ অনুতাপ অনুশোচনা বেরিয়ে আসে, সে মদ ছাড়তে চায়, মদ তাকে ছাড়ে না। নিমে জানে পিতামাতা তাকে প্রাণ দিয়ে মানুষ করেছেন। সকলে তাকে ঘৃণা করে, স্ত্রী করে না। সে আড়ালে চোখের জল ফেলে, স্বামীকে রক্ষা করে। মদ্যপান নিমেকে আক্রমণ করেছে। সেখান থেকে ফিরে আসার উপায় নেই। নিমে মাতাল মাঝে মাঝে অশ্লীল কথা বলে, কিন্তু তার চরিত্র দোষ ঘটেনি। নিমের স্বগতোক্তিতে মাঝে মাঝে ট্রাজেডির নৈরাশ্য ফুটে উঠেছে, প্রহসনের নায়ক অটল প্রাধান্য পেয়েছে নিমে, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিমচাঁদ সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য করেছেন, —

'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ প্রহসন ও শ্রেষ্ঠতম রচনা। নব্যশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যুবক সম্প্রদায়ের মদ্যাসক্তি সে সময় সংক্রামক ব্যাধির মতো বিস্তার লাভ করে। মদ্যাসক্তির জন্য বহু প্রতিভাশালী যুবকের জীবন নষ্ট হয় মনে করা যেতে পারে, মদ্যপানের কুফল প্রদর্শনই এই নাটক রচনায় দীনবন্ধুর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য এই নাটকে গৌণ, নাট্যকার এখানে উচ্চাঙ্গ সৃষ্টি কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। 'সধবার একাদশী'র নায়ক নিমচাঁদ এক আশ্চর্য সৃষ্টি, বিদ্যাচর্চায় শানিত বুদ্ধি ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী নিমচাঁদের অনুশোচনা ও অন্তর্বেদনার শেষ নেই, নিজের অধঃপতন ও দুর্দশা সম্পর্কে সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। কিন্তু প্রবৃত্তির হাত থেকে মুক্তিলাভের কোনো উপায় নেই। প্রখর আত্মসচেতনতা তাকে তীব্র যন্ত্রণাবোধে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করে। নাটকটি ব্যঙ্গকৌতুকে পূর্ণ অথচ এর সঙ্গে নিমচাঁদের কণ্ঠে মাঝে মাঝে সুগভীর নৈরাশ্য ও বিষাদের সুর উচ্চকিত হয়ে হাসিকে বেদনাভারাক্রান্ত করে তোলে।

সধবার একাদশীতে নাটকের মতো পঞ্চসন্ধি আছে। তবে এটি নাটক নয়, পুরোপুরি নাটক ও প্রহসনের মধ্যস্থলে আছে সধবার একাদশী। সমাজের কুক্রিয়া দেখানো এর উদ্দেশ্য। এই প্রহসনে বিভিন্ন পাত্রপাত্রী ও ঘটনা সমাবেশে সমাজের ভব্যতা ও শালীনতার মুখোশ খসে পড়েছে। প্রত্যেকের সংলাপ সরস ও প্রাণবন্ত এবং চরিত্রবিকাশে সহায়ক।

সংলাপে ভাষার শ্লীলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু মনে রাখা দরকার সংলাপে ভাষার শুদ্ধি রাখলে চরিত্র সৃষ্টি হত না। চরিত্রের প্রয়োজনে অমার্জিত রুচিহীন সংলাপ অনিবার্য ছিল।

দীনবন্ধুর কিছু কবিতা ও 'সমালয়ে জীবন্ত মানুষ' নামে গদ্য রচনা আছে। এ সকলে এই সমস্ত আলোচনার প্রয়োজন নয়। নাট্যকার দীনবন্ধুর ট্রাজিকমেডী নাটক। 'নীলদর্পণ' আর 'সধবার একাদশী' রঙ্গব্যঙ্গ - মুখর '[illegible]' প্রহসন, পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটক রচনার যুগে তিনি জীবনের সমতলভূমিতে নাটককে নামিয়ে এনে বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের পথটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

অসামান্য ত্রুটি - বিচ্যুতি সত্ত্বেও দীনবন্ধু বাস্তববাদী হিসেবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ধুলো মাটির উপর বিচরণ করে মাটির মানুষের হৃদয়কে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার প্রকল্পের উপদেষ্টা প্রিয় শিক্ষক সুরজিৎ মন্ডল, দীপঙ্কর সরকার, মধুমিতা বাসু, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, তিনি এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমাকে সমস্তরকমভাবে সাহায্য করেছেন। প্রকল্পের ধারনা, প্রকল্প তৈরি, তথ্যসংগ্রহ বিভিন্ন চিত্র সহ বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং একটি প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করে, আমায় প্রকল্প (নির্মাণ) করার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে সহযোগিতা করেছেন, এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

EXAMINED

(External) 2/9/23

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

সাথী দীপ্ত

তারিখ – 02.09.23